



বন্ধুবিদায়

হুমায়ুন আহমেদ | তারিখ: ১৩-১১-২০১১

৩৭ বছরের পুরোনো বন্ধু, সুখ ও দুঃখাদিনের সঙ্গীকে বিদায় জানিয়েছি। আমাদের বন্ধুত্বকে কেউ সহজভাবে নেয়নি। পারিবারিকভাবে তাকে কুৎসিত অপমান করা হয়েছে। তার পরও বন্ধু আমাকে ছেড়ে যায়নি। আমেরিকায় এসে তার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হলো। হায় রে আমেরিকা! বুদ্ধিমান পাঠক নিশ্চয়ই ধরে ফেলেছেন, আমি সিগারেট-বন্ধুর কথা বলছি। ৩৭ বছরের সম্পর্ক এক কথায় কীভাবে বাতিল হলো, তা বলার আগে জীবনের প্রথম সিগারেট টানার গল্পটা করা যেতে পারে।

চিটাগাং কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস সিক্সে পড়ি।

আমাদের বাসা স্কুলের পাশেই, নালাপাড়ায়। একদিন স্কুলে যাওয়ার সময় লক্ষ করলাম, বাবা তাঁর সিগারেটের প্যাকেট ভুলে ফেলে গেছেন। প্যাকেটে তিনটা সিগারেট। আমি এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্যাকেটটি প্যান্টের পকেটে ভরে ফেললাম। রাত্নাঘর থেকে দেশলাই নিলাম। স্কুলে গেলাম উত্তেজিত অবস্থায়। ভয়ংকর কোনো নিষিদ্ধ কাজ করার আনন্দে তখন শরীর কাঁপছে।

আমি সিগারেট ধরলাম স্কুলের বাথরুমে। সেটা কখন—ক্লাস চলার সময়ে, নাকি টিফিন পিরিয়ডে—তা মনে করতে পারছি না। সস্তা স্টার সিগারেটের (এর চেয়ে দামি সিগারেট কেনার সামর্থ্য বাবার ছিল না) কঠিন ধোঁয়ায় বালকের কচি ফুসফুস আক্রান্ত হলো। আমি বিকট শব্দে কাশছি। হঠাৎ বাথরুমের দরজা খুলে গেল। বাথরুমের দরজা উত্তেজনার কারণেই বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম। স্যারদের বাথরুম ছাত্রদের বাথরুমের সঙ্গেই। বাইরে থেকে তালা লাগানো থাকে। স্যাররা চাবি নিয়ে আসেন। বড়ুয়া স্যার কুক্ষণে এসে আসামির কানে ধরে হেডস্যারের রুমে নিয়ে গেলেন।

হেডস্যার অবাক হয়ে বললেন, তুই এই বয়সে সিগারেটের প্যাকেট পকেটে নিয়ে ঘুরিস? তোকে স্কুল থেকে টিসি দেব। কাল তোর বাবাকে নিয়ে আসবি।

আমি বললাম, জি, আচ্ছা।

হেডস্যার বললেন, তোর বাবাকে আনার দরকার নেই। তোকে আজই টিসি দিয়ে দিচ্ছি। যন্ত্রণা পুষে লাভ নেই।

বড়ুয়া স্যার (আমাদের ক্লাসটিচার। অতি বিচিত্র কারণে তাঁর ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রকে সন্তানের অধিক স্নেহ করতেন।) বললেন, থাক, মাফ করে দেন। ছেলের বাবা এই ঘটনা জানলে ছেলেকে মারধর করবেন। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। এমন শাস্তি দেব, জীবনে সিগারেট ধরবে না। প্রয়োজনে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে সারা গায়ে ছাঁকা দিব।

বড়ুয়া স্যার (আমাদের ক্লাসটিচার। অতি বিচিত্র কারণে তাঁর ক্লাসের প্রতিটি ছাত্রকে সন্তানের অধিক স্নেহ করতেন।) বললেন, থাক, মাফ করে দেন। ছেলের বাবা এই ঘটনা জানলে ছেলেকে মারধর করবেন। আমি ব্যবস্থা নিচ্ছি। এমন শাস্তি দেব, জীবনে সিগারেট ধরবে না। প্রয়োজনে জ্বলন্ত সিগারেট দিয়ে সারা গায়ে ছাঁকা দিব।

বড়ুয়া স্যার কঠিন শাস্তিই দিলেন। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, বাবা রে, বিড়ি-সিগারেট খুব খারাপ জিনিস। আর কোনো দিন খাবি না।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বললাম, খাব না, স্যার। কোনো দিন খাব না।

বড়ুয়া স্যার আরও একবার আমার মহাবিপদে আমাকে উদ্ধার করতে অনেক দেনদরবার করেছিলেন। কাঠপেঙ্গিল-এর কোনো লেখায় বিস্তারিত বলেছি। আবারও বলি।

আমি ছিলাম মহা দুষ্ট। পড়াশোনার সঙ্গে সম্পর্কহীন এক বালক। কাজেই ক্লাস সিক্সের ফাইনাল পরীক্ষায় আমি একা ফেল করলাম। তখনকার স্কুলের নিয়মে ক্লাস সিক্স থেকে সব ছেলে নতুন ক্লাসে গেল। আমি একা বসে রইলাম। ক্লাসে আমি আর বড়ুয়া স্যার। ফেল করার সংবাদ বাসায় কীভাবে দেব, এই আতঙ্কে অস্থির হয়ে কাঁদছি। বাবা কিছু বলবেন না আমি জানি। তিনি তাঁর সমগ্র জীবনে তাঁর পুত্র-কন্যাদের গায়ে হাত তোলা দূরে থাকুক, ধমকও দেননি। কিন্তু মা অন্য জিনিস। তিনি মেরে তজ্জা বানিয়ে দেবেন।

বড়ুয়া স্যার কিছুক্ষণ আমার কান্না দেখে বললেন, আয় আমার সঙ্গে। হেডস্যারকে বলে-কয়ে দেখি বিশেষ বিবেচনায় কিছু করা যায় কি না।

হেডস্যার বড়ুয়া স্যারের ওপর অত্যন্ত রাগ করলেন। তিনি কঠিন গলায় বললেন, যে ছেলে ড্রয়িং ছাড়া প্রতিটি বিষয়ে ফেল করেছে, আপনি তার জন্য সুপারিশ করতে এসেছেন? এই ছেলেকে আমি তো স্কুলেই রাখব না।

বড়ুয়া স্যার বললেন, স্যার, এই ছেলেটাকে পাস করিয়ে দিন। আমি আর কোনো দিন আপনার কাছে কোনো সুপারিশ নিয়ে আসব না।

বিশেষ বিবেচনায় হেডস্যার আমাকে ক্লাস সেভেনে প্রমোশন দিলেন।

পুরোনো দিনের কথা থাকুক, এখনকার কথা বলি।

স্লোয়ান কেটারিংয়ের ডাক্তাররা জানতে চাইলেন, আমি সিগারেট খাই কি না।

আমি লজ্জিত মুখে বললাম, হ্যাঁ।

দিনে কয়টা?

আমি মিনমিন করে বললাম, ত্রিশটা।

সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথের আমার হার্টের চিকিৎসক ফিলিপকো আমি এখনো ত্রিশটা সিগারেট দিনে খাই শুনে এমনভাবে তাকিয়েছিলেন যেন আমি মানুষ না, জন্তুবিশেষ।

ঢাকায় আমার বন্ধু এবং হার্টের চিকিৎসক ডা. বরেন আমার সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ শুনে আনন্দিত গলায় বলেছিলেন, হুমায়ূন ভাই, আপনি তো মারা যাবেন! (ডা. বরেন কারও আগাম মৃত্যুসংবাদ কেন জানি খুব আনন্দের সঙ্গে দেন।)

স্লোয়ান কেটারিংয়ের ডাক্তার আমার সিগারেট খাওয়া নিয়ে কিছুই বললেন না। আমি খানিকটা কনফিউজড হয়ে গেলাম। তবে কেমোথেরাপি শুরুর আগের দিন আমাকে হাসপাতালে ডাকা হলো। তারা বলল, আমার চামড়া কেটে তার ভেতর একটি নিকোটিন রিলিজিং যন্ত্র ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। শরীর যখন নিকোটিনের জন্য কাতর হবে, তখন যন্ত্র নিকোটিন রিলিজ করবে। খুব ধীরে ধীরে নিকোটিনের পরিমাণ যন্ত্র কমাবে।

আমি বললাম, শরীরের ভেতর আমি যন্ত্র ঢোকাব না। সিগারেট ছেড়ে দিলাম।

তারা বলল, যে দিনে ত্রিশটা সিগারেট খায়, সে সিগারেট ছাড়তে পারবে না।

আমি বললাম, পারব।

আশ্চর্যের ব্যাপার, পেরেছি।

আমাদের বাড়ির সামনে একটি ডেইলি গ্রোসারি শপ আছে। সেখানে চা-কফি পাওয়া যায়। যখন কাউকে দেখি কফির মগ নিয়ে বাইরে এসে সিগারেট ধরিয়ে টানছে, তখন এত ভালো লাগে! মনে হয়, তারা কী সুখেই না আছে!

যারা সিগারেট ছেড়ে দেয়, তারা অতি দ্রুত সিগারেটবিদ্বেষী হয়ে ওঠে। যেমন আমার বন্ধু প্রতীক প্রকাশনার মালিক, একসময়ের গল্পকার আলমগীর রহমান। সে একসময় দিনে দুই প্যাকেট সিগারেট খেত। সিগারেট ছাড়ার পর আমাদের দিকে এমনভাবে তাকায়, যেন আমরা সিগারেট না, কাগজে মুড়ে গুয়ের পুরিয়া খাচ্ছি।

আমার ক্ষেত্রে কখনো এ রকম হবে না। পরিচিত কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে আমি তার পিঠে হাত রেখে বলব, আরাম করে খাও! আমি দেখি।

সিগারেট প্রসঙ্গে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা গল্প বলি। একবার নিউইয়র্কে তাঁর সঙ্গে এক হোটেলে উঠেছি (প্যান অ্যাম হোটেল)। দেখি, তিনি সিগারেট খাচ্ছেন না, চুরুট টানছেন। আমি বললাম, সিগারেট বাদ দিয়ে চুরুট কেন?

উনি বিরক্ত গলায় কী একটা মহিলা কলেজের নাম করে বললেন, ছাত্রীরা এই সমস্যা করেছে। সভার মাঝখানে দল বেঁধে মঞ্চে এসে বলেছে, 'আপনাকে সিগারেট ছাড়তে হবে। মঞ্চেই কথা দিতে হবে।' আমি বাধ্য হয়ে সিগারেট ছাড়ার ঘোষণা দিয়ে চুরুট ধরেছি।

আরও কিছুদিন অতিরিক্ত বেঁচে থাকার জন্য মানুষ অনেক কিছু ত্যাগ করে। মানুষকে দোষ দিয়ে লাভ কী? গলিত স্থবির ব্যাঙও নাকি দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে। অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

আমি কখনো অতিরিক্ত কিছুদিন বাঁচার জন্য সিগারেটের আনন্দ ছাড়ার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। আমি ভেবে রেখেছিলাম ডাক্তারকে বলব, আমি একজন লেখক। নিকোটিনের বিষে আমার শরীরের প্রতিটি কোষ অভ্যস্ত। তোমরা আমার চিকিৎসা করো, কিন্তু আমি সিগারেট ছাড়ব না।

তাহলে কেন ছাড়লাম?

পুত্র নিনিত হামাগুড়ি থেকে হাঁটা শিখেছে। বিষয়টা পুরোপুরি রঙ করতে পারিনি। দু-এক পা হেঁটেই ধুম করে পড়ে যায়। ব্যথা পেয়ে কাঁদে।

একদিন বসে আছি। টিভিতে খবর দেখছি। হঠাৎ চোখ গেল নিনিতের দিকে। সে হামাগুড়ি পজিশন থেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসছে আমার দিকে। তার ছোট শরীর টলমল করছে। যেকোনো সময় পড়ে যাবে এমন অবস্থা। আমি ডান হাত তার দিকে বাড়িয়ে দিতেই সে হাঁটা বাদ দিয়ে দৌড়ে হাতের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বিশ্বজয়ের ভঙ্গিতে হাসল। তখনই মনে হলো, এই ছেলেটির সঙ্গে আরও কিছুদিন আমার থাকা উচিত। সিগারেট ছাড়ার সিদ্ধান্ত সেই মুহূর্তেই নিয়ে নিলাম।

পাদটীকা

আমেরিকার মহান লেখক মার্ক টোয়েন বলেছেন, অনেকেই বলে সিগারেট ছাড়া কঠিন ব্যাপার। আমি তাদের কথা শুনেই অবাক হই। সিগারেট ছাড়া কঠিন কিছুই না। আমি ১৫৭ বার সিগারেট ছেড়েছি।